অহংকার

একবারের ঘটনা, সাহাবী হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলে কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক ব্যক্তির সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। ক্রোধের আতিশয্যে আমি তাকে বলে বসলাম, হে কৃষ্ণকায় নারীর সন্তান! আমার একথা শুনে, রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবূ যর! ‘উভয় পাল্লা সমান। কৃষ্ণকায় নারীর সন্তানের উপর শ্বেতকায় নারীর সন্তানের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।’ আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একথা শুনে আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম এবং লোকটিকে বললাম, তুমি আমার গন্ডদেশকে পদতলে পিষ্ট কর।

অন্যের চাইতে নিজেকে বড় মনে করাই অহংকার।

শরী’আতের পরিভাষায় অহংকার হচ্ছে, হককে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করা এবং কোনো বিষয়ে নিজেকে বড় মনে করে অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

হককে প্রত্যাখ্যান করা অর্থ হককে অস্বীকার করা, হককে কবুল না করে তার প্রতি অবজ্ঞা করা এবং হক কবুল করা হতে বিরত থাকা।

মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা অর্থ মানুষকে নিকৃষ্ট মনে করা, অবজ্ঞা করা, তুচ্ছ মনে করা ও মানুষকে ঘৃণা করা। মানুষের গুণের থেকে নিজের গুণকে বড় মনে করা। কারো কোনো কর্মকে স্বীকৃতি না দেওয়া, কোনো ভালো গুণকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা না থাকা। অন্যদের সালাম না দেওয়া, কারো উপদেশ গ্রহণ না করা। নিজেকে অন্যের অপেক্ষা জ্ঞানী মনে করা। গরীব, মিসকিন, অসহায় ও দুর্বল লোকদের সাথে উঠা বসা করাকে ঘৃণার চোখে দেখা এবং তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ, উপহাস এবং তিরস্কার করা। অন্যদের দোষ প্রকাশ ও তাদের দুর্বলতা বর্ণনা করা তথা চোগলখোরি ও গীবত করা। নিজেকে নির্দোষ, নিরপরাধ ও কামেল ব্যক্তি মনেকরে নিকৃষ্ট ও দোষণীয় কাজের ওপর অটুট থাকা এবং কারো উপদেশ গ্রহণ না করা। হাঁটার সময় তার সামনে কেউ হাঁটুক তা পছন্দ না করা, নিজেই আগে আগে হাঁটতে পছন্দ করা। অপরের দাঁড়িয়ে সম্মান করাকে পছন্দ করা।

ড. মুশফিক আহমেদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, অহংকারের মেজাজ হল, নিজেকে উপরে উঠানো এবং অন্যকে নীচে নামানো, অন্যকে নিজের থাবার মধ্যে আনা। যেমন বিড়াল যদি ইদুরকে পায় থাবা দিয়ে আহত করে এবং ছেড়ে দেয়। ইদুর আহত অবস্থায় আস্তে আস্তে গর্তের দিকে চলে। ঠিক

গর্তে পৌঁছার পূর্ব মুহূর্তে বিড়াল আবার ইদুরকে ধরে এবং আছাড় দেয়। আগে ধরে না। সে মজা দেখে। ঠিক গর্তে ঢোকার পূর্ব মুহূর্তে ধরে। এটার মধ্যে সে আনন্দ পায়। অহংকারের মেজাজ ঠিক এধরনের। অন্যকে আঘাত করবে, অন্যকে অধিনস্থ রাখবে, নিজেকে উপরে উঠাবে, আর এটা দেখে সে আনন্দ পাবে।(মোজাকারা হতে)

অভিশপ্ত ইবলিসের কুফরী করা ও আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হওয়ার একমাত্র কারণই ছিল তার অহংকার। সৃষ্টিজগতের প্রথম মানব আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তা’য়ালা ফেরেশতাদের আদেশ করেছিলেন-তোমরা আদমকে সিজদা কর। সকল ফেরেশতা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু ফেরেশতাদের মাঝে বেড়ে ওঠা শয়তান মাটি আর আগুনের যুক্তি হাজির করল। সে আগুনের তৈরি বলে মাটির তৈরি মানুষকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানাল। কুরআনের ভাষায়: সে অস্বীকৃতি জানাল এবং অহংকার করল। আর সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।(সূরা বাকারা;৩৪)

মহান আল্লাহ তা’য়ালা যদি ইবলিসকে বলতেন, আমাকে ১০০সিজদা কর, তাহলে ইবলিস ১০০ কেন ১ লক্ষ সিজদা করত। কিন্তু ইবলিস নিজেকে বড় মনে করল। সে অহঙ্কার করল যে, সে আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

যখন কোনো মানুষের অন্তরে অহংকার ও বড়াই এর অনুপ্রবেশ ঘটে, তখন তা তার জ্ঞান, বুদ্ধির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তাকে নানাবিধ প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে বাধ্য করে সত্যকে অস্বীকার ও বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করতে। অহংকারী ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন হতে বঞ্চিত হয়। অহংকারী ব্যক্তি কখনো কারো উপদেশ গ্রহণ করে না। সে মনে করে আমিতো কামিল ব্যক্তি আমার থেকে বড় আর কে হতে পারে? যে আমাকে উপদেশ দিবে। এছাড়াও সে কিভাবে মানুষের উপদেশ গ্রহণ করবে? সে নিজেই মানুষকে উপদেশ দিয়ে বেড়ায়। যে ব্যক্তি অহংকার করতে চায় ও বড়ত্ব দেখাতে চায় আল্লাহ তাকে নীচে ছুড়ে ফেলে দেন ও বেইজ্জত করেন। অহংকারীর নাম জাব্বারিনদের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। সর্বপরি হংকারীর আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। রসূলে কারীম সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যার অন্তরে সরিষার দানা (অর্থাৎ সামান্য তম) পরিমাণও অহংকার আছে, সে (প্রথম পর্যায়েই) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং যার অন্তরে সরিষার দানা (সামান্যতম) পরিমাণ ঈমান আছে সে জাহান্নামে (স্থায়ীভাবে) প্রবেশ করবে না।’(মুসলিম)

অহংকার ও বড়াই মানবাত্মার জন্য খুবই ক্ষতিকর ও মারাত্মক ব্যাধি,

যা একজন মানুষকে হেদায়াত ও সত্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহির পথের দিকে নিয়ে যায়। ইসলামে অহংকারকে হারাম করা হয়েছে। এজন্য আমাদের সকলেরই উচিৎ এই ব্যাধির চিকিৎসায় সচেষ্ট হওয়া।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মহান আল্লাহ তা’য়ালা আমাদের সকলকে অহংকার হতে বেঁচে থাকার তৈফিক দান করুন। আমিন।

লেখক:

বয়োকেমিস্ট, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়, খুলনা।

পেঁয়াজ সমাচার এবং আমাদের চরিত্র

সম্প্রতি একরকম হঠাৎ করেই বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানী বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। অবশ্য কিছুদিন আগেও একবার এরকম করেছিলো তারা। এর ফলে তখনও যে ঘটনা ঘটেছিলো এখনও ঠিক সেই ঘটনাই ঘটলো। রফতানী বন্ধ ঘোষনা দেবার পরদিনই বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম দ্বিগুনেরও বেশি হয়ে গেলো। অথচ সরকার বারবার বলছে তাদেরকাছে যে পরিমাণ পেঁয়াজ মজুত আছে তাতে অন্তত ৩ মাস চলা যাবে। তাহলে পেঁয়াজের দাম বাড়লো কেন?

সরকারের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে তো অন্তত ২ মাস বা তার বেশি সময়ের আগে বাংলাদেশে পেঁয়াজের সংকট তৈরি হবার কথা না। তাহলে দাম বাড়লো কেন? কারা বাড়ালো এবং কেন বাড়ালো? আমরা হরহামেশাই ভারতকে গালমন্দ করি যে তাদেরকে বাংলাদেশের বন্ধু বলা হলেও তারা আসলে আমাদের শত্রু। তারা সব সময় আমাদের বিপদে ফেলে। ভারত আমাদের বন্ধু না শত্রু সে তর্কে আজকে না যেয়ে বরং তর্কের খাতিরে ধরে নিলামতারা আমাদের শত্রু সে কারনে তারা হঠাৎ করে পেঁয়াজের রফতানী বন্ধ করে দিয়ে আমাদের বিপদে ফেলতে চেয়েছে বা বিপদে ফেলে দিয়েছে।

কিন্তু ৩ মাসের মজুত থাকার পরও হঠাৎ করে দাম বাড়িয়ে দিয়ে আমরা কি

করলাম? আমরা তো আমাদের শত্রু না তাহলে কেন করলাম এই কাজ? কেন এই বিপদের সময় দেশের সাধারণ মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে নিজের লোভ মেটাতে তৎপর হলাম। এর উত্তর কে দেবে? অথচ আমাদের কি করা উচিত ছিলো ভারত যেহেতু আমাদের বিপদে ফেলতে চেয়েছে তাই যাতে আমরা সে বিপদে না পড়ি তার জন্য বাজার স্থিতিশীল রেখে অন্য কোন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানীর সর্বাত্বক চেষ্টা করা। এবং এই সময়কালে দেশের মানুষের যেন কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাতে দাম যথেষ্ঠ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণে থাকে।

এছাড়া ভারত যেহেতু বারবার রফতানী বন্ধ করে দিচ্ছে সেটা যে কারনেই করুক না কেন এবং তাতে আমাদের যেহেতু বিপদ হচ্ছে সেহেতু পেঁয়াজ আমদানীর ক্ষেত্রে ভারতের প্রতি অতি নির্ভরতা বন্ধ করে অন্যান্য বাজারের দিকে নজর দেয়া।সেটাই তো সত্যিকারের নাগরিক এবং দেশপ্রেমের কাজ। কিন্তু সেটা কি আমরা করলাম? না করলাম না। তার বদলে কিছু মানুষ নিজের অধিক মুনাফা করার লোভে দেশের সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করে সিন্ডিকেট বানিয়ে পেঁয়াজের দাম দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে দিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে।এই যদি হয় আমাদের দেশপ্রেমের নমুনা তাহলে ভারতকে লাগবে না আমাদের দেশের বারোটা বাজানোর জন্য আমরা নিজেরাই যথেষ্ঠ।আমার তো মনে হয় এ সমস্ত মানুষ এরকম সুযোগের অপেক্ষাতেই থাকে কখন দেশের এরকম সংকটকাল আসবে আর তারা সেই অবস্থাকে জিম্মি করে টাকার পাহাড় গড়বে।আমরা সব সময় অন্যের ছিদ্রান্বেশনকরে বেড়াই অথচ নিজেদের দোষ কখনই আমাদের চোখে পড়ে না।

আমার তো মনে হয় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকাররা যা করেছিলো এখন আমাদের দেশের পেঁয়াজ ব্যবসায়ীরাও তাই করলো । রাজাকাররা নিজেদের দেশের মানুষের বিপক্ষে গিয়ে পাকিস্থানের পক্ষে কাজ করেছিলো এখনও এ দেশের পেঁয়াজ ব্যবসায়ীরা নিজেদের দেশের মানুষের বিপক্ষে গিয়ে নিজেদের পেট ভরালো। দুইটাই তো নিজের দেশের বিরুদ্ধে বেঈমানী করা।অবশ্য এই ধরনের কাজ এটাই প্রথম নয়।

যখনই কোন সংকট আসে সব সময়ই কিছু মানুষ সেই সংকটময় মুহুর্তকে তাদের নিজের মুনাফা করার সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করে।এটাই এই দেশের কিছু মানুষের চরিত্র! পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে যখন কোন উৎসব হয় তখন সেই দেশে বিভিন্ন রকম পণ্যে বিভিন্ন রকম ছাড় এবং মূল্য কম করা হয় অথচ আমাদের দেশে যখন কোন উৎসব আসে তখন সেটা যেন মানুষের গলাকাটার উৎসবে পরিণত হয়। এমনকি পবিত্র রমজান মাসে যখন সবচেয়ে

সংযম প্রদর্শন করা উচিত কিন্তু রমজান মাসটাই যেন আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের সারা বছরের মধ্যে সবচেয়ে মুনাফা করার মাস হিসাবে বিবেচিত হয়।

আসলে আমাদের নিজেদেরক্ষতি করার জন্য কোন ভারত কিংবা অন্য কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না আমরা নিজেরাই যথেষ্ঠ নিজেদের ক্ষতি করার জন্য। যতদিন আমাদের এই চরিত্র না বদলাবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের কোন উন্নতি সম্ভব নয়।

লেখক : গণমাধ্যমকর্মী

হৃদয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী তৎকালীন ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ইন্টেলিজেন্স এর ডিজিএফআই ঢাকার ডিটাসমেনট এর প্রধান এবং বৃহত্তর সুন্দরবন এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খ্যাত মেজর জিয়াউদ্দিন আহমেদ আদালতে দেয়া সাক্ষ্যে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালের সন্ধ্যায় তিনি বঙ্গভবনে যান সেখানে রাষ্ট্রপতি রুমে বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক তাহেরউদ্দিন ঠাকুর মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এমএইচ খান বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার সামরিক সচিব কর্নেল জামিল ঘাতকদের সদস্যমেজর ডালিম মেজর শাহরিয়ার রশিদ মেজর ফারুক মেজর নূর মেজর মহিউদ্দিন মেজর আজিজ পাশা আলোচনারত ছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা খুনি মোশতাক তাহের ঠাকুর মাহবুব আলমসহ অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেদিন বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে জড়িত ছিল। দেশবাসী যা চাই সব ক্ষেত্রে তার প্রাপ্তি ঘটে না নইলে আব্রাহাম লিংকন ঘাতকদের হাতে প্রাণ দিবেন কেন? তার এমন মৃত্যু কি কেউ কামনা করেছিল? কেউ কি কামনা করেছিল গান্ধীজীর উন্মুক্ত বক্ষে বুলেটের আঘাত হবে ? মার্টিন লুথার কিং প্রাণহীন দেহ এমনি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

নামটির সাথে মিশে আছে জীবনের ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট হার না মানা পঁয়ত্রিশটি ছোট-বড় সংগ্রামের অমরকীর্তি গাঁথা জীবন্ত ইতিহাস শেখ মুজিবুর রহমান ।

১৫ আগস্টের সেই শিহরিত হৃদয়বিদারক শোকাহত ইতিহাসটি কি ছিল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানতে হবে। প্রতিটি ছাত্র সমাজ যুবসমাজ সাংবাদিক সমাজ সভ্যসমাজকে এই ১৫ আগস্টের ইতিহাস অবশ্যই জানতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা স্বাধীনতার পক্ষে থাকবো, মানবতার পক্ষে থাকবো, শোষিতের পক্ষে থাকবো নাকি অধিকার হরণ শোষণ সাম্রাজ্যবাদী দুর্নীতিবাজ বিতর্কিতদের পক্ষে থাকবো?

১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলেও তাঁর মৃত্যু নেই কেননা একটি জাতি, রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি তিনি। যতদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এ ভূখন্ডের আকাশ বাতাস মাটি আর মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন তিনি । বঙ্গবন্ধু একটি আদর্শের নাম মানবতার ফেরিওয়ালা। পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্তনে যে কজন মহান নেতা নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাদের মধ্যেঅন্যতম আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫সাল ১৫ আগস্ট শুক্রবার প্রথম প্রহর বাংলার আকাশে গভীর ষড়যন্ত্রের কালো মেঘ ।

বাংলাদেশের মাটিতে প্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী বলে অহংকার করা পাকিস্তানি বাহিনীর অপমানজনক পরাজয় এবং অসহায় আত্মসমর্পণ কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি পাকিস্তান সামরিক সরকার । তাই ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তারা স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাকে আইএসআই দায়িত্বদেয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য । পৃথিবীর শাসক সম্রজ্যবাদী শক্তিগুলোর সরাসরি মদদ ছিল।

বঙ্গবন্ধুর মতো আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়নেতাকে সরিয়ে দেওয়াটা সত্যিই অসম্ভব অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু সেটাই ঘটেছিল ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট। বিশ্বের প্রভাবশালী আমেরিকা সহ জাতিসংঘ মিশনের মাধ্যমে তারা এই বাংলাকে ফিরে পেতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। সেই সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতির বন্ধু নয় তিনি হয়েছিলেন গোটা বিশ্বের শোষিত মানুষের প্রকৃত বন্ধু আর

অন্যদিকে হয়েছিলেন শোষকদের শত্রু। পরাজিত সাম্রাজ্যবাদীরা বঙ্গবন্ধুর মতো মহান এবং উদার হৃদয়ের প্রিয় মানবতাবাদি নেতাকে কখনো মেনে নিতে পারেনি।

প্রিয় অভিভাবক, একটু ভাববেন কি?

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। একজন বয়স্ক লোককে বলতে শুনলাম, ‘সেই দিন কি আর আছে? দুনিয়া বদলে গেছে।’ বললাম, ‘চাচা, সেই দিন দিনই আছে। সেই দুনিয়া দুনিয়াই আছে। শুধু মানুষগুলো বদলে গেছে।’

মুরব্বি চাচা কথাটা বড় আক্ষেপ করেই বললেন। চারিদিকে যেভাবে শুরু হয়েছে কিশোর কিশোরীদের চলা ফেরা তাতে এমন কথা বলা স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। দিন দিন আমাদের কিশোর কিশোরীদের মধ্যে যেভাবে অপসংস্কৃতি ঢুকে যাচ্ছে তাতে ওদের নিয়ে দু’কথা না বলেও উপায় নেই। সংস্কৃতির চর্চা করতে গিয়ে অপসংস্কৃতি ঢুকে পড়ছে। দেখে দেখে শিখবে শিখুক। ভালো কাজ হলে আপত্তি নেই। কিন্তু মন্দটা নিয়ে কথাতো বলতেই হয়।

আমরা সকলেই সৌন্দর্য পছন্দ করি। তাই বলে এমন সৌন্দর্য চাই না, যে সৌন্দর্য আমাকে, আপনাকে বিপথে নিয়ে যাবে। সৌন্দর্য আবার বিপথে নিয়ে যায় কি করে? হ্যাঁ সে কথায় আসছি।

একজন মানুষের স্বভাব, মন-মানসিকতা কেমন হবে তা তার পরিবার, সমাজ, পরিবেশ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাবা-মায়ের শাসন-বারণ অনেকটা এগুলোর উপর নির্ভর করে। আপনার সন্তানকে আপনি যেভাবে গড়ে তুলবেন সে সেভাবেই গড়ে উঠবে। শিশুরাতো নরম তুলতুলে উপকরণ, যে ছাচে ফেলবেন সেটাই তৈরি হবে।

আমরা ছোটবেলায় সন্ধ্যার পর রাস্তায় বের হলে পাড়াতো চাচা, ভাইয়েরা বলতো, ‘ খোকা, সন্ধ্যার সময় বাইরে থাকতে নেই? বাড়ি যাও, পড় গিয়ে।’ তখন আর উপায় থাকতো না। তাদের সাথে তর্কবিতর্ক করার কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ আমাদের শাসন করার অধিকার তাদেরকে দেওয়া হত। কিন্ত বর্তমান সময়ে সেই অধিকার খর্ব হয়েছে।

এখন ছেলেমেয়েরা বড়দের সাথে তর্কবিতর্ক করে। জোর করে কিছু বললে বরং অভিভাবকেরাই বলে, ‘আমার ছেলেমেয়েকে শাসন করার তুমি কে হে।’ আমি বলি কি, আমাদের অনেক কিছুই। আপনার অবাধ্য সন্তানের জন্য আমারটা যে নষ্ট হতে চলেছে।

ছেলে-মেয়েদের এই বেখেয়ালিপনা, বখাটে হয়ে যাওয়ার পিছনে সবচেয়ে

বেশি দায়ী অভিভাবকেরা।

রাতের বেলা চায়ের দোকনে সিনেমা দেখতে আসবে পথ দেখার জন্য ছেলেকে টর্চ লাইট কিনে দিতে দেখেছি আমি। এইতো সেদিনের কথা, সেলুনে গিয়ে দেখি আমার এক পরিচিতজন তার ছেলের মাথার চুলের কাটিং দিয়েছে বাটি কাট। আমি বললাম, ‘ছেলের চুল এভাবে কাটালে কেন?’ প্রতিউত্তরে বলল, ‘আশেপাশে এখন এই চলছে।’ আমি বললাম, ‘আশেপাশে কিন্তু এখন এমনও চলছে, বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসা, গায়ে হাত পর্যন্ত উঠানো। এসবগুলোর জন্যেও প্রস্তুত হও। তুমিই ওকে সব চলাচলি শেখাচ্ছো।’

আমাকে দিয়েই বলি। যখন সিনেমা দেখতাম তখন কল্পনায় নিজেকে সিনেমার নায়ক মনে করতাম। দেখা গেল সিনেমা চলাকালীন নায়কের মারপিট দেখে আমিও পাশের জনকে হঠাৎ দুম করে বসিয়ে দিয়েছি। অথবা সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছি দুমা দুম দু ঘুষি। নায়কের হাত-কপাল কেটে, ফেটে গেলে নায়িকা শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে বেঁধে দিতেন।

কিন্তু আমি গো বেচারা প্রতিক্রিয়া পেতাম বকুনি আর হাতের অসহ্য ব্যথা। এরপরও ক্ষান্ত হইনি। নায়কের মত হতেই হবে। এ জন্য দেখাদেখি চুল ছেটেছি, প্যান্ট কিনেছি ছেঁড়া ফাঁটা। এখন আমার মেজাজ মর্জি দেখে কে। আমিও নায়ক। হায় হায়, বাড়িতে এসে দেখি ভাত নাই। বুঝলেন না? যদি বলি হাড়িতে ভাত নেই, সেটাও ঠিক আবার যদি বলি সমাজে আমার কোনো মূল্য নেই সেটাও মন্দ বলা হবে না। কল্পনার নায়কের বাস্তবের এই হাল।

এমন ঘটনাও রহরহ ঘটছে, ভারতের নাটক সিনেমার সিরিয়াল দেখে ওসব চরিত্র নিজের মধ্যে কল্পনায় এঁকে নিজেকে ওমন পোশাকে সাজাতে বাধ্য করেছে পোশাক কিনে দিতে। হয় পোশাক দাও, না হয় বিষ দাও। এজন্যই বলছি, ছেলে-মেয়েরা যে পরিবেশের সাথে পরিচিত হবে সে নিজেকে সেভাবেই প্রস্তুত করতে চাইবে।

এসব ছেলেরাই আজকের গ্যাং কালচার গড়ে তুলছে। টিকটকের অমক ভাই তমক ভাই হয়ে উঠছে। এরা আজ উন্মুক্ত। ইচ্ছে মত চুলের কাটিং দেয়, রঙ করে, বাইক নিয়ে রোড শো করে। অপসংস্কৃতির চর্চা করে। ঘুরে বেড়ায়। নেশা করে।

আপনি হয়ত ভাবছেন, পরের ছেলে, আমার কী। আপনার অনেক কিছুই। আজ অথবা কাল আপনার সন্তান ওদের দেখানো পথেই হাটবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই আজই সতর্ক হোন।

আপনার সন্তানের হাতে এড্রয়েড ফোন তুলে দিচ্ছেন? সে সারাদিন গেমস খেলে সময় পার করছে। লাখ টাকার বাইক কিনে দিচ্ছেন? রাস্তায় নায়কের মত হেলতে দুলতে চলতে চলতে দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে।

অনেক অভিভাবককে বলতে শুনেছি, ‘কি করবো বলো, ওদের সাথে পারা যায় না।’ যখন ওদের সাথে পারা যেত ঠিক তখনি আপনি ইচ্ছে করেই ওদের কাছে হেরে গেছেন। তাই এখন আপনি হারতে বাধ্য হচ্ছে।

একটা কবিতার কথা মনে পড়ে গেলে।

‘ ‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?’’

আমরা সকলেই এই কবিতাটা পড়েছি আর না হয় কারো কাছ থেকে শুনেছি নিশ্চয়। কুসুমকুমারী দাসের বিখ্যাত কবিতা ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতার প্রথম দু লাইন এগুলো। কবি বড় আক্ষেপ নিয়ে লিখেছিলেন এই কবিতা। সত্যিই আজ আদর্শ ছেলের বড়ই অভাব। কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবার ছেলে আজ নিতান্তই হাতে গোনা। আমরাও অপেক্ষায় আছি সেই ছেলের, যে ছেলে সিনেমার নায়ক না হয়ে সত্যিকারের নায়ক হবে; সৎ, নীতিবান ও দেশ প্রেমিক হবে।

চাইনে এমন অপসংস্কৃতি। আমরা বাঙালি। ওমন মর্ডান ছেলের চাইতে ঢের ভালো চাষার ছেলে। বাবার দেওয়া লাখ টাকার বাইকে চেপে রোড শো করা ছেলের চাই হাতে মোহন বাঁশি তুলে নেওয়া গরু মহিষের রাখাল ছেলে অতি উত্তম। যে কিনা মাঠ থেকে ফিরেই বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করবে খাবার খেয়েছে কিনা। চাঁদনি রাতে উঠানে বসে তুলবে ঝুমুর গানের সুর।

লেখক: মুহাম্মদ বরকত আলী (শিশুসাহিত্যিক ও গল্পকার)

মেহেরপুরের উন্নয়ন ভাবনা (শেষ

পর্ব)

অনেক বড় এরিয়া একটি থানার মাধ্যমে কাঙ্খিত নিরাপত্তা সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা এক্ষত্রে আরও একটি থানা চালু করা। যা হতে পারে বামন্দী অথবা সুবিধাজনক স্থানে। তেমনি বাংলাদেশের অন্যতম সেরা দুটি বীজ ফার্ম আমঝুপি ও বারাদিকে আরও আধুনিকায়ন পদক্ষেপ গ্রহন।

মেহেরপুর ও গাংনী পৌরসভার আয়তন বৃদ্ধি করা। গ্রাম থেকে জেলা পর্যায়ে পরিকল্পিত আবাসন গড়ে তোলা, বহুতল ভবন নির্মাণে আধুনিক বিল্ডিং কোড মেনে চলে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মেহেরপুর ও গাংনী উপজেলা আধুনিকভাবে মুজিবনগর মডেল অনুসরণে উপজেলা অবকাঠামো নির্মাণ করা। আলু, পিঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, টমেটো, গাজর, আম, কাঁঠাল, দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়াজাত এবং বৃহৎ আকারে পাট প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র সহ বিদেশে রপ্তানিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

নিরাপদ খাদ্যের গ্রামীণ হাট নির্দিষ্ট স্থানে গড়ে তোলা। কৃষকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা । এছাড়া অবশ্যই মেহেরপুর জেলার বিসিক শিল্প নগরীকে আধুনিক উন্নয়নমুখী বাস্তবায়ন রূপ দেওয়ার নিমিত্তে আয়তন বৃদ্ধি, টেরিফ ফ্রি জোন ঘোষণা করা সহ সহজ শর্তে জমি ও ঋণ কর্মসূচি চালু করা। আন্তর্জাতিক মানের কৃষি শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলা।

৭। সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত স¦য়ংসম্পূর্ণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার সমন¦য়ে একটি ৫০ মেগোওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সুব্যবস্থা করা। পারিবারিক শেয়ারে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে। জনগণের জন্য বিশুদ্ধ পানি বিদ্যুৎ জ্বালানী সুনিশ্চিত পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ভোক্তা অধিকার সুনিশ্চিত করা। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় মাদক, ভেজাল ঔষধ, সার, বীজ, অস্ত্র, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, বেকারত্ব, স¦ল্পশিক্ষা, বাল্যবিবাহ এবং বিভিন্ন অপরাধ ও অপরাধী চক্র ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব রুখে দিতে সর্বমহলে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি, নিরাপদ সীমান্ত নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য প্রশস্ত বর্ডার বেল্ট পাকা রাস্তা তৈরি করা খুবই জরুরি। সর্বোস্তরে যোগ্য নেতা নির্বাচনের জন্য প্রক্রিয়া চালু করা। জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে যাত্রীছাওনি ও ওয়াশরুমের ব্যবস্থা।

রাত্রে নিরাপদ আলোয় পথ চলা সুনিশ্চিত করা। জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহকে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। সন্ত্রাস, মাদক, ইভটিচিং, চাঁদাবাজ, অপরাধ প্রতিবাদ প্রতিরোধে পাড়া ভিত্তিক শান্তি প্রিয় নাগরিক কমিটি গঠন।

৮। ছাত্র ও যুব সমাজ একটি জাতির সেরা হাতিয়ার এবং শক্তি। তাদের নৈতিক আদর্শ, দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠা, মেধা ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে ফ্রি ও অংশীদার ভিত্তিক মুক্ত চিন্তার কø◌াব, ব্লাড ব্যাংক, হেলপ ক্লাব, বাঙ্গালী সাংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্লাব প্রতিষ্ঠা কর্মসূচিসহ গণসচেতনতা মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

মেধা ও প্রতিভা মূল্যায়নে সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নাম করণে বৃত্তি ফাউন্ডেশন চালু করা। তিন উপজেলায় পাঁচতলা বিশিষ্ট একটি করে ইনডোর স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠা করাসহ মেহেরপুর স্টেডিয়ামকে পূর্ণাঙ্গ রুপ দেওয়া। মেহেরপুর পৌর গড় পুকুর কেন্দ্রীক একটি আধুনিক পার্ক গড়ে তোলা যেখানে ওভার ব্রীজ, ওয়াকিং জোন এবং একটি জীমনেশিয়াম থাকবে। বি.কে.এস.পি.তে চৌকষ ছাত্রদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেনিং এর উদ্যোগ গ্রহণ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় মানের করা। স্কুল কলেজ বাস সার্ভিস চালু করা। শিশু শিক্ষায় ভাল অবদান রাখা চলমান কিন্ডার গার্টেন গুলো যে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাদের আরও উৎসাহিত করে শিশু শিক্ষার মানকে আরও উন্নত করতে জোর সুপারিশ করা সহ সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান সুনিশ্চিত করা । এছাড়াও কোচিং ও গাইড বাণিজ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। স্কুল ভিত্তিক ইতিহাস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস গুলো নতুন মাত্রায় যথাযথ মর্যাদায় পালন। তিন উপজেলায় আধুনিক প্রতিবন্ধী স্কুল প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্নক চেষ্টাসহ তাদের জন্য একটি আর্নিং হাউজ প্রতিষ্ঠা করা।

৯। দ্রুতগতির প্রযুক্তির এই বিশ্বে টেকনিক্যাল মানব সম্পদ উন্নয়নে যুব উন্নয়ন নির্ধারিত ট্রেনিং সেন্টারের বাস্তবায়ন সহ এভাবে বিভিন্ন বিদেশের চাহিদা এমন ট্রেড শিক্ষা ও ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে সরাসরি বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যাংক, দ্যা ল ক্লাব, হজ¦ কাফেলা, মাদক, ভেজাল খাদ্য, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে নাগরিক সেবা প্রদান, পার্ট টাইম আড্ডা জব নামে প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে যেখানে ছাত্র সমাজ শিক্ষিত বেকার তাদের সময় ও মেধাকে অপচয় না করে পার্ট টাইম জব করে অর্থ ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ তৈরী করা।

১০। সেবা-আয়-স্বনির্ভরতা এই তিন নীতিতে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবার পূর্ণস্বনির্ভর হবেই এই লক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারকে একটি বাড়ি একটি প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত করা এবং একজন করে দক্ষ জনশক্তি বিদেশে পাঠানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং সকলেই উন্নয়নে হবে অংশীদার। পরিবেশ রক্ষা এবং সবুজ মেহেরপুর গড়ে তুলতে পাঁচ কোটি পরিকল্পিত বৃক্ষ রোপণ এবং এ থেকে স্থায়ী ফান্ড গঠন। অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে, ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে হবে, হাতে সময় খুবই কম। দারিদ্রতা, বৈষম্য ও বিলাসিতা এই তিন অপরাধের জন্ম দেয়। যে কোন ভালকে স¦◌াগতম জানাতে হবে।

গর্বিত ১৭ই এপ্রিল চেতনায় সময়ের প্রয়োজনে আমাদের এই উন্নয়ন ভাবনা। আমাদের রাজটিকা সৌভাগ্যকে সর্বোত্তম ব্যবহার করে যার যার স্থান থেকে উন্নয়ন ইস্যুতে কাজ করতে হবে। ঐতিহাসিক কারণেই মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর জেলার উন্নয়নে প্রতিটি সরকারকেই কাজে লাগাতে হবে। প্রতিটি দুয়ারে দুয়ারে এই আন্দোলন ও অধিকার তুলে ধরি এবং বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

যারা মেহেরপুর উন্নয়নে ব্যক্তিগত, সংগঠন, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে অবদান রেখেছে এবং রেখে চলেছে তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ ও সম্মান জানায়। আমরা চাই ২০৫০ সালকে সামনে রেখে রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যন্ত একটি উচ্চমানের মাস্টার প্লানে সকল পরিকল্পনা ও উন্নয়ন গড়ে উঠুক। আমরা স্থায়ী উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং গঠনমূলক সমালোচনায় বিশ্বাসী।

দলমত নির্বিশেষে সকলের সাথে উন্নয়নে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহযোগী হিসাবে পাশে সবায়কে কাজ করতে হবে। যে কোন অন্যায় অবিচারকে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে নির্ভীক কন্ঠস্বর হিসাবে মেহেরপুরবাসীকে কাজ করে যাওয়ার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

মেহেরপুরের উন্নয়ন ভাবনা-২য়

পর্ব

৩। মেহেরপুর জেলাবাসীর জীবনের সাথে অতোপ্রত ভাবে জড়িয়ে আছে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল এবং মা ও শিশু কেন্দ্রটি। হাসপাতালের বয়স আজ ২০/২২ বছর হলো কিন্তু চার গুণ রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও চিকিৎসা সেবা বহুধাপ নেমেছে নীচে, যা আমাদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

এই হাসপাতালের উপর ভর করে অনেকে বড় বড় নেতা ও সম্পদশালী হয়েছেন এবং হচ্ছেন অথচ হাসপাতালের দুঃসময় তাদের কাছে শুধুই রাজনীতির হাতিয়ার মাত্র। উল্লেখ্য ইতোমাধ্যে নতুন ভবনের কাজ শুরু হয়েছে ।

চরম অবহেলিত এই আধুনিক হাসপাতালকে ২৪ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সেন্ট্রাল এসি, লিফ্ট সিস্টেম করা সহ সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ সেবা পাওয়ার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা এবং ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এন্ড মেডিকেল কলেজে উন্নতিকরণসহ পর্যাপ্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

অনুমোদন প্রাপ্ত নার্সিং ইনষ্টিটিউট দ্রুত বাস্তবায়ন, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ডাক্তার বিহীন সেবা চলছে এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলির সেবা নিশ্চিত করাসহ মেহেরপুর শহরসহ ২ উপজেলায় ডায়াবেটিস হাসপাতাল আধুনিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ। সমৃদ্ধি অর্জনের পূর্বশর্ত দেশ প্রেম চেতনায় সৃষ্টিশীল মেধা প্রতিভা ও সততার সর্বোচ্চ সম্মান এবং মূল্যায়ন করতে হবে।

৪। আগামীতে নিশ্চিত পানি যুদ্ধ। এই যুদ্ধের অন্যতম ভয়াবহতা মোকাবেলা করতে হবে মেহেরপুরবাসীকে। সেইদিক বিবেচনা করেই এখন কেবলই স্মৃতি বিজড়িত বাংলার নদী মাতৃক নিশ্চিত প্রবাহকে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে মেহেরপুর জেলার প্রাণ ভৈরব, কাজলা ও ছেওটিয়া নদী সহ সকল নদী পরিকল্পিতভাবে গভীর খনন করা এবং পানির দীর্ঘ মেয়াদি চাহিদা সুনিশ্চিত করা। উল্লেখ্য ভৈরব নদী শেখ হাসিনার সরকার অনেকাংশে ইতোমধ্যে খনন করেছে। ভৈরবনদী সহ রক্ষণাবেক্ষণ সংস্কার জেলা পরিষদ পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ভৈরব কেন্দ্রিক পঞ্চমুখি পর্যটন স্বনির্ভর প্রকল্প বাস্তবায়ন দরকার।

শিক্ষিত যুবক যুবতি নিয়ে সমবায় ভিত্তিক এই স্বনির্ভর প্রকল্প চালু করা। নেট খাঁচা পদ্ধতিতে সমবায় বাণিজ্যিক মাছ চাষ, ২৫ লক্ষ

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অতিকষ্টে উপার্জিত অর্থ হতে বাংলাদেশের সর্ব উচ্চ থেকে সর্বনিম্ন ব্যক্তির বেতনের ৮০ ভাগ পরিশোধ করা হয় অথচ সেই শ্রমজীবী মানুষ আজ চরম ভাবে অবহেলিত। নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘুচিয়ে সকল ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা। যে কোনো অপচয় রোধ করি এবং সঞ্চয়ী হই, আবেগ দিয়ে নয় বিবেক দিয়ে বিবেচনা করি, কর্মকে সাথী করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রীতি, বন্ধন, উন্নয়ন, মানবতার আধুনিক মেহেরপুর গড়ে তুলি। ইতিহাস আমাদের শক্তি, সমৃদ্ধি অর্জনের অনুপ্রেরণা।

৬। সারা বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম আদর্শ সেরা কৃষি অঞ্চল হিসাবে খ্যাত এই মেহেরপুর জেলা। এখানকার উর্বর কৃষি জমি রক্ষা এবং কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ঠিক মূল্য ও আধুনিক কৃষি সেবা পাওয়ার সুব্যবস্থা করা। শস্য ফলজ, তৈলজ, প্রাণীজ ও মৎস এই তিন মিলেই আধুনিক কৃষিতে বিপ্লব ঘটেছে। সুস্বাস্থ্য জাতি গঠনে রাসায়নিক সার, বিষ ও ভেজাল খাদ্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত এবং জৈব সারের ব্যবহার বাধ্যতামূলক নিশ্চিত করা।

গাংনী মেহেরপুর জেলার সংসদীয় ২ আসন। ৯টি ইউনিয়ন, একটি উপজেলা, একটি পৌরসভা ও একটি থানা নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। জেলার সার্বিক উন্নয়নে গাংনী উপজেলাকে বিশেষ পরিকল্পনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এর মধ্যে গাংনীর চিৎলা কৃষি ফার্ম বাংলাদেশের সেরা একটি বৃহৎ বীজ উৎপাদন সেন্টার।

সময়ের প্রয়োজনেই এই ফার্মটিকে একটি আন্তর্জাতিক মানের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি ও জিওগ্রাফী বিশ্ববিদ্যালয় ও রিসার্স সেন্টার চালু করা। ইতোমধ্যে সেখানে কৃষি বিশ^বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় আলোচনায় আসছে। গাংনীর ভাটপাড়া নীলকুঠি প্রায় ১৪০ বিঘা জমির উপর ব্রিটিশ ব্যবহƒত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এখন সরকারী আওতায় এই স্থানটিকে আয় বর্ধক পর্যটন কেন্দ্রীক একটি অর্থনৈতিক জোন গড়ে তোলা। সেখানে যে পার্কটি গড়ে তোলা হয়েছে তার আধুনিকায়ন করতে হবে। (চলবে)

কোন পথে হাঁটবে শিশুরা?

ছোট বেলা থেকেই বড়দের বলতে শুনেছি, ‘আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ’। তখন অবশ্য ভবিষ্যতের ‘ভ’ বর্ণটা কেবল স্লেটে লেখা শিখেছি। কিন্তু প্রগাঢ় রূপে বোঝার সুযোগ হয়নি।

ভূমিষ্ঠকালীন ব্যক্তির প্রাথমিক রূপ শিশু (ঈযরষফ)। শিশু হিসেবে সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে সেই চিহ্নিত হয়ে আছে যে এখনও যৌবনপ্রাপ্ত হয়নি কিংবা বয়ঃসন্ধিক্ষণে প্রবেশ করেনি। ইউনিসেফ’র শিশুসনদে আছে ০-১৮ নিচে বয়স এমন সকলেই শিশু। জীববিজ্ঞানের ভাষায় – মনুষ্য সন্তানের জন্ম এবং বয়ঃসন্ধির মধ্যবর্তী পর্যায়ের রূপ হচ্ছে শিশু। চিকিৎসাশাস্ত্রের সংজ্ঞানুযায়ী মায়ের মাতৃগর্ভে ভ্রুণ আকারে অ-ভূমিষ্ঠ সন্তানই শিশু। এই শিশুদের জন্য প্রতি বছর স্বীকৃত একটা বিশেষ দিনও থাকে, যাকে আমরা বলি শিশু দিবস।

১৯২৫ সালে শিশু কল্যাণ বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের সময় জেনেভাতে প্রথম আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ঘোষণা করা হয়েছিল। শিশু দিবস বাচ্চাদের সম্মানে প্রতিবছর পালিত একটি স্মরণীয় দিন। প্রতিটি দেশের সিদ্ধান্তানুসারে দিনটি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে । বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনটিকে শিশু দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ১৭ মার্চ শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১ জুন ১৯৫০ সাল থেকে বেশিরভাগ কমিউনিস্ট এবং উত্তর-পূর্ববর্তী কমিউনিস্ট দেশগুলিতে দিনটি উদযাপিত হয়। ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর ইউএন-ইউনাইটেড নেশন(টঘ) জেনারেল অ্যাসেমব্লির মাধ্যমে শিশু অধিকারের ঘোষণার স্মরণে বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়।

শিশু দিবস পালন করার যথার্থ মর্ম আমরা কতটুকু বুঝি? নিজের বিবেককে প্রশ্ন করে দেখি? আমার ঘরের শিশুটি কতটুকু নিরাপদ? সে কি নিজেকে বিকশীত কিংবা মুক্তমনা করতে পারছে? শতাংশের অবস্থানে দেখা যাবে অর্ধেকেরও নিচে বসবাস আমাদের। তার একটা বিশেষ কারণও আছে। শিশু হিসেবে বেড়ে ওঠা আগামীর অগ্রদূত নিজের মতো বাঁচতে শেখার আগেই ঘটে বড় বিপত্তি।

একটা শিশুর জন্মের পর তাকে দেখতে আসা শুভাকাক্সিক্ষরা প্রথমে কোলে তুলে নিয়েই বলেন, মণি/বাবু তোমাকে কিন্তু চাচার মতো হতে হবে। কেউ বলেন তোমাকে নানার মতো হতে হবে, আবার কেউবা বলেন খালার মতো হতে হবে। মা-বাবার সামাজিক অবস্থান যদি অন্যের কাছে

বাইরে নয়। মূলত এটা বোধশক্তি ও দৃষ্টি ভঙ্গির বিষয়।

“ যখন যেমন মনে করি তাই হতে পাই যদি, আমি তবে এক্ষুণি হই ইচ্ছামতি নদী”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাও বলে দেয় শিশুরা ওদের ইচ্ছা মত করে বাঁচতে চায়। আপনিতো অভিভাবক অর্থাৎ শিশুর মঙ্গলকামনাকারী, চিন্তক এবং পথ নির্দেশক। ওকে চার দেওয়ালের গন্ডিতে বাঁধবেন না। ওকে বলবেন রাস্তার বাঁ পাশ দিয়ে হাঁটতে হয়, কখনও সে ডান পাশে যাবে না। ক্লাসের ‘সেরা’ শব্দ দখল করতে বইয়ের বোঝা পিঠে চাপাবেন না। সাঁতার কাটাতে শেখান, ডুববে না। কাদা-মাটি মাখুক, মন নোংড়া হবে না। গল্পে গল্পে বাংলার ইতিহাস জানান, শেকড়ের টান বিনষ্ট হবে না।

মাঝে মাঝে গ্রামীণ পরিবেশে নিয়ে যান, দেখবেন সে কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, তাঁতি, গাছ, মাছ, পশু, পাখি সহ পরিবেশকে ভালোবাসতে শিখবে। নিয়মিত প্রার্থনালয়ে নিয়ে যান, কখনও সে অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি হিংসা, অশ্রদ্ধা শিখবে না। সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত করুন, বিপথ উঁকি দেবে না। সাইকেল চালাতে শেখান, আপনার সন্তান পিছিয়ে থাকবে না। লেখ্য, কথ্য, আঞ্চলিক যা হোক বাংলা ভাষা শেখান, সে ইংরেজিতে গালা গাল দেবে না।

শিশুর সামনে শিক্ষামূলক কিছু দেখুন, ভবিষ্যতে শিশুটি মোবাইলে গেম কিংবা অলীক স্বপ্নে ভাসবে না। আপনি ওর মতামত শুনুন, নৈতিক শিক্ষা দিন দেখবেন কখনও সে আপনাকে মেরে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে না। ভুল করলে শিশুর গায়ে আঘাত না করে সঠিকটা উপস্থাপন করুন। আপনার কাছে আকাশের রং নীল হলেও শিশুর কাছে কালো, লাল বা অন্য যেকোন রং হতে পারে। কারণ আকাশটা শিশু দেখছে, আপনি নন। ওর চোখে নিজের চোখ মেলাবেন না।

আমাদের দেশে আজও বহু সুস্থ শিশু জন্মায়, কিন্তু বেশির ভাগ শিশু একটা সময় পরিবার ও সমাজের কারণে রূপান্তরিত হয় মানসীক প্রতিবন্ধীতে। শিশুর মনের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে তার মন জগতের স্তরকে ধ্বংস করা আর এর দায় বহন কিন্তু আমাদের সকলকে করতে হবে। ভেবে দেখুন দায় মুক্ত হবেন, নাকি দায়ের ভারে সারাটা জীবন ঋণী থাকবেন? সমাধানের পথ নির্বাচন নিজেকেই করতে হবে।

উন্নয়ন কর্মী
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

মুজিবনগরই বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। প্রথম রাজধানী ছিল মুজিবনগর। এ নিয়ে ভিন্নমত থাকার কথা নয়। যদিও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোন কোন অতি উৎসাহী পক্ষ প্রকৃত ইতিহাস কে অস্বীকার করে নিজেদের অনুকূলে নেয়ার অপচেষ্টা করছেন।

তাঁদের প্রতিশ্রদ্ধা রেখেই জানাতে চাই ——–

১। পাকিস্তানের নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের রেকর্ড করা এক বেতার ভাষণ শিলিগুড়ির এক বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে।

মুক্তাঞ্চল তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার বাগোয়ান ইউনিয়নের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের বিশাল আম বাগানে ১৭ এপ্রিল উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেন। পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয় হয়।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ১১ এপ্রিলের প্রথম বেতার বক্তৃতাকে বৈধ সরকার গঠণের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ করার জন্য স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণার তারিখ ১০ এপ্রিল ১৯৭১ বলে পরবর্তীতে ঘোষণা করা হয়।

প্রথম সরকারের শপথের স্থান বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নতুন নাম করণ করা হয় নতুন রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ‘মুজিবনগর’। আর মুজিবনগর কে নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষণা করে নতুন সরকার। সেই ঘোষণা অনুসারে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের সকল দলিল, নথি, প্রকাশনা ও সম্প্রচারে রাষ্ট্রের রাজধানীর নাম মুজিবনগর হিসাবে উল্লেখ করা শুরু হয়।

তাই বলে কি চুয়াডাঙ্গা জেলা দাবী করতে পারবে যে তারা ফুটবল খেলায় বিজয়ী জেলা?

সুতরাং আসুন আমরা ইতিহাস স্বীকৃত বিষয় টি নিয়ে কোন বিতর্কে না যেয়ে সহজ ভাবে মানতে শিখি মুজিবনগরই হলো বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী।

লেখকঃ সাংবাদিক জি টিভি, দৈনিক সংবাদ, ডেইলি অবজারভার।

মেপ্র/আরপি

ভাস্কো-দা-গামা থেকে মুজিবনগর —মাসুম উল হক মিন্টু

১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষে আসার সমুদ্রপথ আবিস্কার করার পর ফরাশি ও ইউরোপীয় বণিকদের এই উপমহাদেশে আগমনের আগ্রহ জাগে ১৫৯৯ সালে ২১৮ জন সদস্য নিয়ে লন্ডনে “দুঃসাহসী বনিক গোষ্ঠী নামে বণিক সংঘ গঠন হয়। ১৬০০ সালের ১লা ডিসেম্বর ” ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ” নামে মহারানী সনদ লাভ করে এবং রানী স্বয়ং কোম্পানির অংশীদার হন। ১৬১৩ সালে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর এক ফরমানের মাধ্যমে সূরাটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বানিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন।

বিভিন্ন কারনে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে যার ফলে ১৬৮৬ সালে হুগলি,বালেশ্বর,হিজলি মোঘল দুর্গ আক্রমন ১৬৮৭সালে চট্রগাম আক্রমন করে পরাজিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা এবং ১৬৯০ সালে মোঘল ও ইস্ট ইন্ডিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৬৯৮সালে কোম্পানি কলকাকায় ফোর্ট উলিয়াম দুর্গ স্থাপন করে।

১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল সিরাজ -উদ-দৌলা বাংলা, বিহার, উড়িস্যার নবাব হিসাবে সিংহাসনে বসেন। মুলতো বিনাশুল্কে বানিজ্য কে কেন্দ্র করে নতুন নবাব ১৭৫৬ সালের ৪ জুন কাসিমবাজার কুঠি আক্রমন এবং ২০ জুন কলকাতা দখল করেন। শুরু হয় প্রাসাদ ষঢ়যন্ত্র ১৭৫৭

সালের ২৩ জুন পলাশী যুদ্ধের পরাজয়ের পর ২৯ জুন ১৭৫৭ তে মীর জাফর পুত্র মিরনের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ নবাব সিরাজ কে নৃশংসভাবে হত্যা করে। শুরু হল পুতুল নবাবদের হাত ধরে ব্রিটিশ শাসন যা চলমান ছিল ১৯৪৭ পযন্ত।

মুলতো ১৭৬৪ সালে বক্সার যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের সিমানা বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিছুদিন না যেতেই বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিস হটাও আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। শতাধিক বছর পথ পরিক্রমার পর ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বে (মুম্বাই) এ বসে প্রতিষ্ঠা হয় “”ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস””।

১৯০৬ সালে সালে ঢাকায় বসে গঠিত হয় “” মুসলিম লীগ”। অল্পকথায় বলি মুলতো মুসলিম লীগ ও ভারতীয় জাতীয় কংগেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফসল ১৯৪৭ সালের ভারত, পাকিস্থান স্বাধীনতা। জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যথাক্রমে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট জন্মলাভ করলো জিন্নার নেতৃত্বে পাকিস্থান ও নেহেরুর নেতৃত্বে ভারত।

আমরা হতভাগ্য জাতি হলাম পূর্ব পাকিস্থানেরর বাসিন্দা । শুরু হল নতুন খেলা রাষ্ট্রের শাসনভার পশ্চিমাদের হাতে থাকায় শাসনের নামে শোসন, যে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি…!

১৯৫২ সালের সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার বীজ বপন এবং১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তা অর্জন ছিল আমাদের পরাধীনতা থেকে মুক্তি।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে নির্বাচনে জয়লাভের পর গদিতে বসতে না দেওয়ায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষনের মধ্যে দিয়ে ববঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষনা ছিল বাঙ্গালি জাতির পরাধীনতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন।

২৬ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষনা পত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার পথে বাংলাদেশ । এবার সরকার গঠনের পালা
১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর সাবডিবিশনে সিমান্তবতি গ্রাম বৈদ্যনাথ তলায় বাংলাদেশর স্বাধীনতার ঘোষনার আদেশ জারি করা হয় এবং ১৭ এপ্রিল এই প্রবাসি সরকার সফত গ্রহন করেন যা মুজিবনগর সরকার নামে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেয়। দীর্ঘ নয়মাস মহান মুক্তিযুদ্ধেরর মধ্যে দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬

ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেয় প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। মেহেরপুরের মুজিবনগর হয়ে ওঠে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বাধীনতার সূতিকাগার ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের রাজনৈতিকদের তৃর্থস্থান মুজিবনগর বর্তমানে বাংলাদেশেরর অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

লেখক: কলেজ শিক্ষক ও সাবেক প্রিন্সিপাল (ইন চার্জ), টি জে ডিগ্রী কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর।